সংবাদ

তারিখ ...২৭।১০।৮৩... পৃষ্ঠা... ৬ কলাম... ১...

022

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১ই কার্তিক, ১৩৯০

শিক্ষক ও ভবিষ্যত নাগরিক

রংপুর জেলার পীরগাছা উপ-জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটা জরিপ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার স্কুল কলেজ-মাদ্রাসার সংখ্যা, শিক্ষক ও ছাত্রদের তথ্য শিক্ষা বিভাগের খাতাপত্রে যা আছে তাতে দেখা যায় গড়ে ৫০ জন ছাত্র প্রতি একজন শিক্ষক আছেন। কিন্তু মানুষ গড়ার এসব কারখানায় যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতি চলছে এবং সেখানে শিক্ষকদের অর্থাৎ ঔপন্যাসিক মনোজবসু যাদের 'মানুষ গড়ার কারিগর' নামে আখ্যায়িত করে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী বলে চিত্রিত করেছেন, তাদের কিছু ভূমিকা ওই তথ্য থেকে জানার উপায় নেই।

শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন চলছে, শিক্ষকরা কিরকম পড়ান, ছাত্রদের. উপস্থিতির হার কিরকম এসব স্কুল কর্তৃপক্ষের বৈষয়িক স্বার্থে এবং স্কুল পরিচালনা সম্পর্কে সরকারের একটা সাধারণ ধারণার জন্য প্রয়োজন। সরকারী চাকরির আওতায় এসেছে বেশির ভাগ স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা, যেসব স্কুল কলেজ এখনও সরকারীকরণ সম্ভব হয়নি, তাদের আবেদন নিবেদন পত্রিকায় চিঠি পত্রের কলমে চোখে পড়ে। শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের অধীনে নেয়ার সুফল দু' ধরনের। প্রথমত এতে বর্তমান আর্থিক সংকটের দিনে শিক্ষকরা বাঁচার মত বেতন পাওয়ার নিশ্চয়তা পান। দ্বিতীয়ত ভবিষ্যত সুনাগরিক গড়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা পুরা না হলেও অনেক খানি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকে।

শিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিক স্কুল এই উদ্দেশ্য নিয়েই স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকার সরকারী পর্যায়ভুক্ত করেন। বর্তমান সরকার এ যাবৎ সেই নীতি ও সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করেছেন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যে রোগে আক্রান্ত হয়, দেখা গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তা থেকে মুক্ত নয়। এ জন্য দায় দায়িত্ব কোন তরফের সে কথার আংশিক জবাব মিলবে সংবাদ-এ প্রকাশিত উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধির জরিপ থেকে। এসব বিষয়ে সরকার যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এমন কথা বলা চলে না।

জরিপে পীরগাছা উপ-জেলায় ১২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৯টির জরিপ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩২টিতে অনিয়ম ও কারচুপি [illegible] হয়েছে, প্রকৃত ছাত্র সংখ্যা ৯১২ জন বাড়িয়ে দেখান হয়েছে। এর সাথে জড়িত রয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। কারণ একটাই, সরকারী অনুদান বাড়িয়ে নেয়া। স্কুল ও মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটি স্বীকার করেছেন ব্যাপারটা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষই এ তথ্য উদঘাটন করেছেন। এখানে স্মরণীয় যে বেশ কয়েক মাস আগে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে তদন্ত করে সরকার অনিয়ম ও কারচুপিরই সন্ধান পাননি, অস্তিত্বহীন স্কুলের নামে টাকা তোলা, ভুয়া তথ্য দাখিল করে অধিক অর্থ সরকারের নিকট থেকে আদায় করেছিল এক শ্রেণীর শিক্ষক। এজন্য সরকার গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল বিভ্রান্তি ছড়াতে চেয়েছিল।

৩২টি স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও স্টাফিং প্যাটার্নের বাইরে ১৭ মাসে ২৩ জন শিক্ষক মোট ১ লাখ ১৯ হাজার টাকা নিয়েছেন। ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো। উপস্থিতির শতকরা হিসাব অনুদান বেশী পাওয়ার উপযোগী করে দেখানোর কারচুপি ধরা পড়েছে। শিক্ষকদের অনুপস্থিতির ব্যাপারটা তো জিয়াউর রহমানের আমলে হাতেনাতে তৎকালীন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ধরেছিলেন, সেই রোগটি এখনও চলছে। পরিদর্শক এলে একটা খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে ওটাকে জায়েজ করিয়ে নেওয়া হয়। ছাত্র উপস্থিতির হার কমপক্ষে ৫০ ভাগ বাড়িয়ে দেখানো হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষকদের এই ভূমিকা দুঃখজনক। এটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। স্বাধীনতার পর সরকারী চাকুরের মর্যাদা পাওয়ার পরই তাদের মধ্যে নৈতিক অবনতি ও অবক্ষয় প্রবল হয়ে উঠেছে। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি, সরকারী চাকরি হিসাবে ক্ষমতাসীন দলের সুনজরে থাকার এবং তোয়াজ করার মানসিকতার মূলে রয়েছে। আত্ম স্বার্থ উদ্ধারের প্রবণতা। সামাজিক ও আর্থিক জীবনে অনিশ্চয়তার মুখে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মরীয়া গ্রস্ত মানসিকতা সম্ভবতঃ এই ধরনের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। বিষয়টি সমাজ বিজ্ঞানীদের ভেবে দেখা দরকার।

কিন্তু বিষয়টির তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনার বাইরে এই অনিয়ম ও কারচুপি বন্ধের জন্য সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মানুষ গড়ার কারিগররা যখন দুর্নীতি অনিয়ম ও অসত্যের আশ্রয় নেন, তখন তারা যাদের শিক্ষা দেন সেই কোমলমতি বালক বালিকা তাদের নিকট থেকে কীভাবে সৎ ও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার তালিম পাবে?

কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি ও তার বিচিত্র গতির মূলে এই সব শিক্ষাদাতার কোন প্রভাব পড়ে না, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। ছাত্র-ছাত্রীদের চোখের সামনে যদি অহরহ মিথ্যাচার ও লোভের এ ধরনের দৃষ্টান্ত থাকে, তবে পাঠ্য বইয়ের নীতিকথা ও আদর্শ অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমাদের ভবিষ্যত নাগরিকদের স্বার্থেই এদিকটায় জরুরী দৃষ্টি দেয়া সরকারের উচিত বলে মনে করি।